নোবেলজয়ী

মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

অনিন্দ্য ভুক্ত
বিপুল দে

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এই ক্ষুদ্রকায় পুস্তক আসলে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর বন্দোবস্ত। অধ্যাপক ইউনূসের মতো এত বর্ণময় চরিত্রকে, নানাবিধ অভিনব ভাবনায় সমৃদ্ধ এক চিন্তাবিদকে, ভাবনাগুলি বাস্তবায়িত করার মতো প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক মানুষকে এত স্বল্প পরিসরে ধরতে যাওয়া নিছক মূর্খামি নয়, সম্পূর্ণ এক অবাস্তব ব্যাপার।

যদি জানিই কাজটা অসম্ভব, উদ্যোগটা অবাস্তব প্রশ্ন তাহলে স্বাভাবিক, কাজটা করতে গেলাম কেন? প্রশ্নের প্রথম উত্তর, স্বতঃস্ফূর্ত এক আবেগ। দ্বিতীয় উত্তর, দায়িত্ববোধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন-এর পর এই তৃতীয় একজন নোবেল ছিনিয়ে আনলেন—যিনি নিখাদ বাঙালি। তাঁর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে তাই আবেগাপ্লুত না হলে সেটাই বোধহয় হত অস্বাভাবিকতা। দ্বিতীয়ত, এমন একজন মানুষ, যিনি প্রথম বিশ্বের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা পর্যন্ত পেয়েছিলেন, কেবলমাত্র মানুষকে ভালোবেসে সেই নিশ্চিন্ত, সম্মানজনক জীবন ছেড়ে যিনি গরিব মানুষগুলির জীবন বদলে দেবার সংগ্রামে নেমে পড়তে পারেন, বর্তমান প্রজন্মকে, পরবর্তী প্রজন্মকেও, তাঁর এই লড়াইয়ের কথা, স্বপ্নের কথা জানানোর একটা দায়বদ্ধতা সবারই থাকে। কাউকে না কাউকে কাজটা করতেই হয়।

তবে কাজটা করলেই তো শুধু হয় না। সেটাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারও একটা থাকে। পুনশ্চ-র মতো একটি প্রথিতযশা প্রকাশনা সংস্থা যে সেই দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছে তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। অতঃপর যাদের জন্য এই বই তাদের ভালো লাগলে আমাদের দুঃসাহস সার্থক বলে মনে করব।

অনিন্দ্য ভুক্ত
বিপুল দে

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	**১১ - ২৬**
একটি অপ্রচলিত ব্যাঙ্ক	১৪
মেয়েদের ব্যাঙ্ক	১৯
ঋণদান নাকি সমাজ-সংস্কার ?	২১
সীমানা ছাড়িয়ে	২৩
গ্রামীণ ঃ একটি আন্দোলনের নাম	২৪
এক নজরে : গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	**২৭ - ৪৪**
ক. গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : একটি ঝলক	২৭
খ. গ্রামীণ উদ্যোগের পরিবার	৪১
গ. গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পুরস্কারের তালিকা	৪৪
মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর জীবন	**৪৫ - ৫৭**
নোবেল এল	৪৭
আমি তোমাদেরই লোক	৫১
শৈশব থেকে কৈশোরে	৫১
যুবক ইউনূস	৫৩
আমেরিকার দিনগুলি	৫৪
দেশে ফেরার পর	৫৭
ইউনূস ও তাঁর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক	**৫৮ - ৭৮**
শুরুর সেই দিনগুলি	৫৮
নবযুগ তেভাগা খামার	৫৯

দীন থেকে দীনতরের কাছে ৬১
ব্যাঙ্কের দোরগোড়ায় ৬৪
লক্ষ্যের পথে আরো এক ধাপ ৬৭
স্বপ্নের দোরগোড়ায় ৭০
অবশেষে আস্ত একটা ব্যাঙ্ক ৭৩
এল স্বাধীনতা ৭৬
এক নজরে : মুহাম্মদ ইউনূস ৭৯ - ১২৮
ক. নানা রঙের দিনগুলি ৭৯
খ. পুরস্কৃত ইউনূস ৮২
গ. ইউনূসের সাম্মানিক পুরস্কারের তালিকা ৮৯
ঘ. ইউনূসের বিশেষ সম্মানের তালিকা ৯১
ঙ. নোবেলজয়ীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ৯৪
চ. মুহাম্মদ ইউনূসের নোবেল ভাষণ ৯৯
ছ. যাঁরা পেয়েছেন শান্তির নোবেল ১১৬

প্রসঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

Poverty is an artificial creation.
Poor people are not asking for charity.
Provide opportunity to the poor.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক নোবেল পুরস্কার ছিনিয়ে নিলেন ব্যাঙ্ক গড়ে। অথচ মুহাম্মদ ইউনূস ব্যাঙ্কার ছিলেন না। ব্যাঙ্কিং রীতিনীতি সম্বন্ধে তাঁর কোনো পড়াশোনা ছিল না। তবু তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ব্যাঙ্ক গড়বেন। গরিব মানুষের ব্যাঙ্ক, নতুন ধরনের ব্যাঙ্ক। সবাই তাঁকে ব্যঙ্গ করেছিল,আক্রমণ করেছিল, প্রাণপনে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বক্সিরহাট রোডের দুলু মিঞা-সুফিয়া খাতুনের তৃতীয় সন্তান কাজে করে দেখিয়েছিলেন।

ব্যাঙ্কিংয়ের প্রথাগত প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সম্ভব করেছিলেন তিনি এমন একটা কাজ? আত্মজীবনীতেই এর উত্তর দিয়েছেন ইউনূস। "আমি প্রচলিত ব্যাঙ্কিং পদ্ধতির দিকে তাকাতাম আর তার উলটো কাজ করতাম। এতেই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক করার কাজটা সোজা হয়ে গেল।"

সাদামাটা দুটি বাক্য। কিন্তু এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রচলিত ব্যাঙ্কিং কাঠামো সম্বন্ধে মানুষটির প্রচণ্ড শ্লেষ। প্রথমে যিনি চেয়েছিলেন সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের একটি ন্যূনতম সম্মানজনক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে, তাঁকে কেন শেষপর্যন্ত নিজের জীবিকা ছেড়ে এসে গড়ে তুলতে হল পুরোদস্তুর একটি ব্যাঙ্ক, সে প্রশ্নের জবাবও লুকিয়ে আছে এই বাক্য দু'টির মধ্যে।

বাস্তবিকই, কাজ যখন শুরু করেন তখন ইউনূসের দূরতম কল্পনাতেও ব্যাঙ্ক তৈরির কোনো স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল না। চোখের সামনে দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষগুলিকে দেখতে দেখতে ইউনূস তাদের দারিদ্র্য-মুক্তির রাস্তা খুঁজতে চেয়েছিলেন। সেই রাস্তা খুঁজতে গিয়েই দেখলেন দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত মানুষদের দারিদ্র্যের ব্যাপারে প্রধানত তাদের উদ্যমহীনতাকেই দায়ী করার যে প্রবণতা আছে তা একেবারে ভ্রান্ত। এরা কেউ পরিশ্রমবিমুখ নয়, বরং সুযোগ পেলে খেটেখুটে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের একটা তাগিদ এদের অধিকাংশের মধ্যেই থাকে। এই সুযোগ তাদের সামনে তৈরি করে দেবার

একটিমাত্র উপায়ই চোখে পড়েছিল ইউনূসের। ইতিমধ্যেই তিনি লক্ষ করে দেখেছেন, এই দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে অনেকেই ধারধোর করে ছোটোখাটো হাতের কাজের মাধ্যমে সংসার চালাবার চেষ্টা করছে। এরা খুব একটা কর্ম-অদক্ষও নয়। ইউনূসের মনে হয়েছিল সামান্য কিছু সহজ শর্তের ঋণের ব্যবস্থা এদের জন্য করতে পারলে এরা নিজেরাই পালটে ফেলতে পারবে নিজেদের আর্থনীতিক অবস্থা। পরবর্তীকালে যখন তাঁর ভাবনা ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে লাগল তখন ইউনূস জোর গলায় বলতে পারলেন, দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবীর জন্য চাই ঋণ পাওয়ার অধিকারকে অন্যতম প্রধান এক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান।

॥ একটি অপ্রচলিত ব্যাঙ্ক ॥

গরিব মানুষের জন্য ঋণের বন্দোবস্ত করবেন, তাদের জন্য ব্যাঙ্ক গড়ে তুলবেন, এই ভাবনাকে মাথার মধ্যে জায়গা করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ভাবনাগুলিও ইউনূসের ভাবনার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। কেন প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এতদিন সে ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি? দোষ কার, ব্যাঙ্কগুলির নাকি গরিব মানুষগুলিরই?

বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত যাচাই করতে গিয়েই ফাঁকফোঁকরগুলি ধরা পড়েছিল ইউনূসের চোখে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গলদ রয়েছে প্রচলিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মধ্যেই। তাঁর মনে হচ্ছিল প্রথাগত ব্যাঙ্কগুলি তৈরিই হয়েছে 'অবিশ্বাস'-এর উপর ভর করে। তারা ক্রেডিট (ঋণ) দেয়, কিন্তু ক্রেডিট শব্দটির অর্থ (বিশ্বাস বা আস্থা)-ই বিশ্বাস করে না। জামানত ছাড়া তারা ঋণ দেয় না। অথচ গরিব মানুষ, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটে না যার, সে বন্ধকী পাবে কোথা থেকে? অর্থাৎ নামে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান হলেও, সত্যিই যাদের ঋণ দরকার বেশি, তাদের জন্য দরজাটা আগেই বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

ঋণ দেবার আগে জামানত, জামিনদার ভালো করে বুঝে নেয় ব্যাঙ্কগুলি। কিন্তু তাতেই কি ঋণের টাকা উদ্ধার হয় তাদের? খোঁজ নিয়ে জানলেন বাংলাদেশের শিল্প ব্যাঙ্ক তাদের প্রদত্ত ঋণের ফেরত পায় মাত্র

১০ শতাংশ। এবং কেবলমাত্র বাংলাদেশ নয়, ঋণ পরিশোধের পরিসংখ্যান সমস্ত বিকাশশীল দেশের ক্ষেত্রেই খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

রোগের উৎস বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হল না ইউনূসের। গরিব মানুষ ঋণ পায় না বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে, পায় ধনী সম্প্রদায়। ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকলেও অনেক সময় এরা ঋণ পরিশোধ করে না। করে না, কারণ এরা জানে ঋণ পরিশোধ না করলেও তাদের টিকি পর্যন্ত ছোঁবার সাধ্য কারো নেই। সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকার, সবাই আছে এদের পেছনে। আর যদি বা আইনি ব্যবস্থার দিকে ঝোঁকে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক, তাহলেও অর্থের জোরে বিচার প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করে দেওয়াটা এদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়।

ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ-সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার সর্বোত্তম উপায় কিন্তু গরিব মানুষের দিকে ঋণ সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। গরিব মানুষ, যে কোনোদিন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌছোতে পারবে বলে ভাবেনি, ঋণ পেলে সে তা পরিশোধেরও আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কারণ সে জানে এই ঋণই তার মুক্তির পথ।

ঋণপ্রার্থী দরিদ্র মানুষ ও ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে আরো একটা প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করলেন ইউনূস। ব্যাঙ্কগুলির নিয়মকানুন, কাগজপত্রের হাজারো ফ্যাকড়া। এই সব কিছুর ভয়েই নিরক্ষর মানুষগুলি চট করে ব্যাঙ্কের দরজায় পা রাখতে চায় না। মহাজনী ঋণের তিক্ত অভিজ্ঞতা বিকাশশীল দেশগুলির গরিব মানুষগুলির কমবেশি প্রায় সকলেরই আছে। ঋণ নেবার সময় একটুকরো কাগজে টিপসই তাদের দিতে হয়। তারপর একসময় মহাজন ঘোষণা করে, ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতার কারণে গরিব মানুষটির যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সে বাজেয়াপ্ত করছে। যত বেশি কাগজপত্র, স্বাভাবিক কারণেই তত বেশি ভয়। ব্যাঙ্কের ধারেকাছে তাই গরিব মানুষ সহজে ঘেঁষতে চায় না।

ব্যাঙ্ক তৈরি করার সিদ্ধান্ত যেদিন নিলেন, সেদিন থেকেই পাশাপাশি কয়েকটা সিদ্ধান্ত তাই একই সঙ্গে নিয়েছিলেন ইউনূস। এক, তাঁর ব্যাঙ্কে গ্রাহকদের আসতে হবে না, ব্যাঙ্কই খুঁজে নেবে তার সম্ভাব্য গ্রাহকদের। দুই, নিয়মকানুন যতদূর সম্ভব সহজ, সরল, সুবোধ্য হবে। কাগজপত্রের

ঝামেলা থাকবে ন্যূনতম। তিন, ধার নেবার জন্য কোনো জামানতের দরকার হবে না।

প্রথম দুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যা কিছু ছিল না। সমস্যা, বিতর্ক সবকিছুই তৃতীয় সিদ্ধান্তটিকে নিয়ে। বন্ধকী বা জামানত ছাড়া সত্যিই কি কিছু ধার দেওয়া যায়, নাকি তা উচিত? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই যেটা মনে রাখা দরকার তা হল বন্ধকী যে সব ক্ষেত্রে নেওয়া হয়, সে সব ক্ষেত্রেও কিন্তু তার মূল্য ঋণ-অর্থের সমপরিমাণ হয় না। অর্থাৎ বন্ধকী নেওয়া হয় ঋণগ্রহীতার মধ্যে এক ধরনের দায়বদ্ধতা তৈরি করতে। এখন এই দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিকে বাদ রেখে যদি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তা কিন্তু কোনো সুফল দিতে পারে না। দায়বিহীন ভোগের অভ্যাস বরং সেক্ষেত্রে সমাজের কর্মোদ্যোগটিই নষ্ট করে দিতে পারে।

এই সমস্যার কথা জানতেন ইউনূসও। তাই সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা তিনি করেননি। কিন্তু বন্ধকীর সাহায্যে নয়, সমস্যাটিকে সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি অন্যভাবে। প্রবর্তন করেছিলেন যৌথ দায়িত্বের ধারণাটি। তাঁর মতে, ঋণ পরিশোধের জন্য প্রধান যেটি দরকার তা হল নজরদারির ব্যবস্থা করা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যা করে তা হল তারা ঋণ দেবার আগে বন্ধকী জমা রাখতে বলে। তারপর একবার বন্ধকী জমা রেখে ঋণদান সম্পন্ন হয়ে গেলে ঋণগ্রহীতার সঙ্গে তাদের আর কোনো যোগাযোগ থাকে না। ঋণগ্রহীতার খোঁজ পড়ে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধিত না হলে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে অনাদায়ী ঋণের সমস্যা যে একটি বড়ো সমস্যা তার কারণ এই নজরদারির অভাব। অর্থাৎ বন্ধকী কিন্তু ঋণ পরিশোধের দায়বদ্ধতা তৈরির কাজে ব্যর্থ বলেই প্রমাণিত। তাই যৌথ দায়িত্বের মাধ্যমে এই নজরদারির বিষয়টিকেই সুনিশ্চিত করতে চেয়েছেন ইউনূস।

যৌথ দায়িত্বের এই প্রকল্পটির জন্যই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কোনো একক গ্রাহককে ঋণ দেয় না। ঋণ দেওয়া হয় পাঁচ জনের একটি দলকে এবং সেটিও দেওয়া হয় পর্যায়ক্রমে। পর্যায়ক্রমে মানে দলের একজন ঋণ পরিশোধ করলে তবেই আসবে দ্বিতীয়জনের পালা। তবে ঋণের

অনুমোদন, ব্যবহার ও পরিশোধের ব্যাপারে দায়িত্ব সমষ্টিগতভাবে দলের হলেও, ঋণের আর্থিক বোঝাটি থাকে ঋণ যিনি নিচ্ছেন ব্যক্তিগতভাবে কেবলমাত্র তাঁরই। অর্থাৎ দলের কোনো একজন ঋণ পরিশোধ না দিলে বা দিতে না পারলে দলের আর কেউই ঋণ পাবে না একথা ঠিক, কিন্তু একজনের অপরিশোধিত ঋণের বোঝা দলের আর বাকি চারজনের ঘাড়ে চাপবে না।

ঋণগ্রহীতাদের যে দল ঋণ নেবে সেই দল গঠনের দায়িত্ব থাকে গ্রাহকদেরই ঘাড়ে। ব্যাঙ্ক এ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করে না। দল গঠনের দায়িত্ব গ্রাহকদের ঘাড়ে চাপানোর কারণ এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়ে যায় একজন ব্যক্তি ঋণ পেতে কতটা আগ্রহী বা ঋণে তার সত্যিই কতটা প্রয়োজন। প্রমাণিত হয়, তার কারণ দল গঠন কিন্তু সত্যিই একটি কঠিন কাজ। ঋণের যার প্রয়োজন নেই, সে এই পরিশ্রম করতে যাবে না।

দলগঠনে যে প্রথম উদ্যোগী হয়, অতঃপর তাকে খুঁজে বার করতে হয় আরো চারজন সদস্যকে। এই সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়াটি প্রথমজন কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করে। সে খোঁজে একইসঙ্গে একজন সৎ ও উদ্যোগী মানুষকে। খোঁজে কারণ দলের অন্যান্য সদস্যদের যোগ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তার নিজের ঋণ পাবার রিষয়টি। বস্তুত দলের সদস্য নির্বাচন ও দল গঠনের এই প্রক্রিয়াটিই ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকে অনেকটা সুনিশ্চিত করে দেয়। যারা ঋণ নিয়ে জীবনের মোড় ঘোরাতে সত্যিই আগ্রহী, যারা পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী, ঋণ কেবল তারাই পাবার যোগ্য হওয়ায় ঋণগ্রহণ ও ঋণপরিশোধ প্রক্রিয়া দুটি চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে।

সদস্য নির্বাচন ও দল গঠনের পর চলে কয়েক দফা প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নিয়মকানুনগুলি কী কী, কীভাবে দল হিসেবে চলতে হবে, এসব ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেবার পরই ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রথমে দলের দুজন সদস্যকে ঋণ দেওয়া হয়। তারা পরবর্তী ছ' সপ্তাহ নিয়মিত ঋণ শোধ করলে পরের দু'জন ঋণ পাবার অধিকারী হন। দলের নেতা ঋণ পান তারপর, সবশেষে।